বাংলাদেশে কর্পোরেট এনজিওর উত্থান

আনু মুহাম্মদ

বাংলাদেশ এখন বিশ্বব্যাপী পরিচিত সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা (ব্র্যাক) এবং সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান (গ্রামীণ ব্যাংক)-এর সূতিকাগার হিসেবে। বিগত চার দশকে বাংলাদেশ পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক বাজারমুখী, অধিক নগরায়িত এবং অধিক বিশ্বায়নমুখী হয়ে উঠেছে। এই সময়ের কিছু দর্শনীয় সাফল্যের মধ্যে রয়েছে গার্মেন্টস রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় (রেমিট্যান্স) এবং খাদ্য উৎপাদন। ক্ষুদ্রঋণ এবং এনজিওর নাটকীয় বিকাশও এই দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ সেই তুলনায় দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উন্নতি খুবই মন্থর। বরং সেই সাথে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে অর্থনৈতিক অসমতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে। এই লেখায় এনজিওর ভূমিকা, নয়া-উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নয়া অর্থনৈতিক বিন্যাসের সাথে এর উত্থানের তাৎপর্য এবং একই সাথে এর পশ্চাদপসরণ, মেরুকরণ, অঙ্গীভবন ও পরবর্তী পর্বে কর্পোরেটাইজেশন বা বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। মূল লেখা Rise of the Corporate NGOs in Bangladesh প্রকাশিত হয়েছিল ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮। **অনুবাদ : আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী**।

"আমরা দরিদ্রকে বাজারের সাথে যুক্ত করেছি"[১]
('উই লিংক দ্য পুওর টু দ্য মার্কেট')

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বৈদেশিক অর্থায়নে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) উল্লেখযোগ্য বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশে এনজিওর এই উত্থান নয়া বৈশ্বিক বিন্যাসের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ভিত্তি হল কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম– এসএপি) এবং দারিদ্র্য বিমোচন (পড়ুন সমন্বয়) কার্যক্রম। যদিও এসএপি আনুষ্ঠানিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল মধ্য আশির দশকে; কিন্তু এর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপত্রের অধিকাংশই সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই বৈশ্বিক 'উন্নয়ন' কর্মসূচির (এজেন্ডা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা (আইএমএফ) সেই সময়ের সমস্ত উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশ বা অর্থনীতিকে তাদের ছকে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছিল; যে ছক মূলত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিন্যস্ত।

বেসরকারীকরণ ও ঋণায়নের (ফিনান্সিয়ালাইজেশন) ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিরোধী একটি মতাদর্শিক প্রচারণা সেই সময় জরুরি ছিল। বলা বাহুল্য, এই প্রচারণা সেই সময় সাফল্যের সাথে রাষ্ট্রকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পেরেছিল এবং ফলশ্রুতিতে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনের জোরালো দাবির আওয়াজকেও স্তিমিত করে এনেছিল। এই রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের ধারাবাহিক অস্বীকৃতি এক বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুধা, রোগ, কর্মহীনতা, অবলম্বনহীনতার সামনে অরক্ষিত অবস্থায় ঠেলে দেয়। এভাবেই সামনে আসে 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' এবং এনজিওর প্রাসঙ্গিকতা। ১৯৭০-এর সময় থেকে এনজিওর উত্থান এবং তাদের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকদের একটি সুসমন্বিত প্রচেষ্টা ছিল কাঠামোগত কারণকে চিহ্নিত না করে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা মোকাবেলার মাধ্যমে নয়া-উদারবাদী পুঁজিবাদী উন্নয়নকে যৌক্তিকতা দান করা।

এই প্রবন্ধে এনজিওর প্রাসঙ্গিকতা ও বহুমাত্রিকতাকে বিশ্লেষণ করা এবং সেই সাথে এনজিও কাঠামোর উদ্ভব, প্রক্রিয়া, অর্জন ও সীমাবদ্ধতাকেও বিশেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এনজিও মডেলের ওপর এবং সেই সাথে বিশেষ করে এর বিকাশের দিকে মূল মনোযোগ রাখব। এই প্রবন্ধে প্রথমত, স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্যাপ), পভার্টি এলিভিয়েশন প্রোগ্রাম বা দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (প্যাপ) এবং এনজিওর উত্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এনজিওর বহুমাত্রিকতা এবং এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, উন্নয়নের ধারণা বদলের সাথে এই মডেলের সমন্বয়ের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। চতুর্থত, এনজিও, সরকার এবং 'দাতা' সংস্থার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চমত, একটি সফলতম (বেস্ট কেস) এনজিও মডেলের উদাহরণ হিসেবে ব্র্যান্ড এনজিও 'ব্র্যাক' সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ, বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বা স্যাপ হলো কিছু কর্মনীতির সমষ্টি (যেমন– আমদানি উদারনীতি, বিনিময় হার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, বেসরকারীকরণ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা বন্ধ ঘোষণা করা, নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য সংকুচিত করা), যার মূল লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক অর্থনীতির দেশগুলোকে প্রভাবশালী মতাদর্শের প্রয়োজন ও অভিমুখের সাথে সামঞ্জস্য করিয়ে নেয়া।

এই কাজে বৈশ্বিক একচেটিয়া পুঁজির ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তাদের ভূমিকা পালন করেছে, যাতে এই বিশ্বকে কর্পোরেট পুঁজির জন্য সুবিধাজনক ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করা যায়। যদিও এই সংস্থাগুলোতে কাজ করছে সারা বিশ্বের টেকনোক্র্যাট বিশেষজ্ঞরা, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ করে মূলত যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জোট, যা আবার পরিচালিত হয় কর্পোরেট-বান্ধব গোঁড়া অর্থনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা। সে সময় যদি কোন দেশ এই ছাঁচে নিজেকে বসাতে ব্যর্থ হত তবে সেই ছাঁচকে বিন্দুমাত্র না বদলে দেশটাকেই ছাঁচের মাপে নিজেকে সাজিয়ে নিতে হত। যে সকল দেশে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে সেসব দেশের পরবর্তী পরিণতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ এবং 'দাতা'দের বিন্দুমাত্র জবাবদিহির দায় ছিল না, যেহেতু প্রশ্ন করার জন্যই আদৌ কেউ ছিল না। নিজেদের গণ্ডির বাইরের কারও কাছে তাদের কোন দায় তারা স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে তারা নানাভাবে দায়মুক্ত অবস্থার মধ্যেই থাকে।

১৯৫০-এর দশক থেকে বিশেষত ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে অনেক সামরিক শাসক এই বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। যদিও কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্যাপ) ও বিশ্বব্যাংক অভিন্ন এবং কখনও কখনও তথাকথিত 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' বা প্যাপকে বিবেচনা করা হয় স্যাপ-এর অ্যান্টিথিসিস হিসেবে, তবে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্যাপকে আন্তর্জাতিক প্রচারণায় পরিণত করতে বিশ্বব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল। সেভাবেই বহু দেশে

'উন্নয়ন'-এর বদলে 'দারিদ্র্য বিমোচন'কে জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এই প্রচেষ্টাকে আমরা দেখতে পারি প্রবৃদ্ধিমুখী আধুনিকায়ন ধারার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের প্রতিরক্ষামূলক কৌশল হিসেবে। তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা ১৯৭৩ সালে তাঁর বহুল প্রচারিত ভাষণে বিশ্বব্যাংকের নীতি-কৌশল পুনর্বিন্যাস, প্যাপমুখী কর্মপন্থা এবং এই ধারায় বর্ধিত অর্থপ্রবাহের ওপর বক্তব্য রাখেন।

মূলত পুঁজিপন্থী উন্নয়নের 'চুইয়ে পড়া' (ট্রিকল ডাউন থিওরি) তত্ত্বের ফলাফল হিসেবে পৃথিবীজুড়ে দারিদ্র্য ও অসমতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে সর্বত্র জন-অসন্তোষ বাড়ছিল। ফলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি পুনর্নির্ধারণ, আর্থিক প্রবাহ, জনমত–সকল দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন, দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও সে সময় একটি উর্বর পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এনজিও মডেলের কিছু পূর্বসূরি পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল (কুমিল্লা মডেল, সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বা আইআরডিপি, স্বনির্ভর ইত্যাদি)। এদের মধ্যে অনেক কর্মসূচিকেই এনজিওর পূর্ব সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পার্থক্য হচ্ছে, এসব কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সরকার পরিচালিত। তবে দরিদ্রদের মধ্যে ছোট দল তৈরি করা, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ইত্যাদি কাজের ধরনে দুই পর্বের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দৃশ্যত, এই সকল উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী সম্পর্কের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রক্ষাকবচ তৈরি করা। কিন্তু এই সকল চেষ্টা যে সফল হয়নি তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান (খান, ১৯৮৩; খান, ১৯৮৭)।

নতুন পর্বের এনজিও ধারণার জন্ম হয় যখন বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ হাজির হয় এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা এনজিও প্রতিষ্ঠায় তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে (মুহাম্মদ, ১৯৮৯)।

সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বব্যাংক ও ইউএসএআইডি তাদের বিভিন্ন অফিসিয়াল দলিলাদিতে নানা সময় এনজিওর অবদান নিয়ে উচ্চকিত প্রশংসা ব্যক্ত করেছে। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ১৯৮০-র শুরুর দিকে 'দারিদ্র্য সম্পর্কিত আয়-উৎপাদী কর্মসংস্থান' বিষয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরে–

> ক) টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ একই রকম সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমির দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং পৃথক-সংগঠিত উৎপাদনমুখী বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক জায়গায় এনেছে এবং পরিকল্পনা ও নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছে, যা সামগ্রিক গ্রামীণ সংগঠনের চাইতে অধিক কার্যকর এবং যা বিদ্যমান গ্রামীণ শক্তি কাঠামোকে সবল করে তোলে।
>
> খ) সুসংগঠিত গ্রুপ কেবল কার্যকর 'আদায়ী কৌশল'ই প্রতিষ্ঠা করে না, সেই সাথে সরকারি এজেন্সি থেকে জোগান ও পর্যাপ্ত সেবাও নিশ্চিত করে।
>
> গ) কিছু ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পেশা রয়েছে, যা প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান/উপার্জনের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম। প্রয়োজনীয় ঋণ, প্রশিক্ষণ ও মার্কেটিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই পেশাগুলোকে কাজে লাগানো যায়; যদিও কিছু সময়ের মধ্যেই তা নিজস্ব সক্ষমতার শেষ সীমায় উপনীত হয়।
>
> ঘ) উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য ঋণের সহজলভ্যতা জরুরি, কিন্তু ঋণ তখনই কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়, যখন তা পরিপূরক বা উৎসাহপ্রদায়ী হিসেবে কিংবা দক্ষ প্রশিক্ষণ বা প্রযুক্তি হিসেবে প্রদান করা হয়।
>
> ঙ) উচ্চ ঋণ পরিশোধ-হার (পর্যাপ্ত সামাজিক ও কৌশলগত পরিচালনার মধ্যে থেকে এবং দলীয় বহুমুখী ভূমিকার কারণে) এবং উপযুক্ত ব্যয় পরিশোধের সামাজিক ইচ্ছা গ্রামীণ ব্যাংকিংকে কার্যকর নিশ্চয়তা দিয়েছে।
>
> চ) দরিদ্র মানুষও সঞ্চয় করতে সক্ষম। আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের গোষ্ঠীগত চাপ গুরুত্বপূর্ণ।
>
> ছ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যক্রম চালাতে একটি নমনীয়, টেকসই, পরীক্ষামূলক ও উদ্যোগনির্ভর সাংগঠনিক/প্রাতিষ্ঠানিক ধারণক্ষমতা জরুরি; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর উদ্যোগ সম্পন্ন করতে উচ্চ প্রশিক্ষণ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনশক্তি, অর্থ ও জোগানের (ইনপুট) প্রয়োজন।
>
> জ) পর্যাপ্ত অর্থের (ফান্ড) সহজলভ্যতা প্রয়োজনের একটি অংশ মাত্র। অন্য অংশটি হল স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ধারণক্ষমতা প্রস্তুতকরণ (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং) (বিশ্বব্যাংক ১৯৮৩:১০০)।

এই প্রবন্ধে প্রথমত, স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্যাপ), পভার্টি এলিভিয়েশন প্রোগ্রাম বা দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (প্যাপ) এবং এনজিওর উত্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এনজিওর বহুমাত্রিকতা এবং এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, উন্নয়নের ধারণা বদলের সাথে এই মডেলের সমন্বয়ের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। চতুর্থত, এনজিও, সরকার এবং 'দাতা' সংস্থার মধ্যকার সম্পর্ক বিশেষণ করা হয়েছে। পঞ্চমত, একটি সফলতম (বেস্ট কেস) এনজিও মডেলের উদাহরণ হিসেবে ব্র্যান্ড এনজিও 'ব্র্যাক' সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ, বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই 'পাঠ' থেকে কিছু প্রশ্নের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সত্যিই কি এনজিও নিজেদেরকে সার্বিক গ্রামীণ সংগঠন থেকে কার্যকর হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে, যা বিদ্যমান গ্রামীণ শক্তিকে সবল করতে সক্ষম? কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এনজিও কি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে? এনজিও-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় বা আয় কি দারিদ্র্যের শিকলমুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

এনজিওর অবস্থান

চার দশক পর বাংলাদেশে ফরেন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশনস অ্যাক্ট বা বৈদেশিক অনুদান বিধি, ২০১৬ এর তালিকাভুক্ত (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম এর আওতাভুক্ত) বর্তমান এনজিওর সংখ্যা ২৪৫৭ (ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এর হিসাব মতে)। এছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য মতে–

> ২৭টি দেশের সর্বমোট ২৩৩ বিদেশি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এনজিও ৭০টি, যুক্তরাজ্যভিত্তিক ৩৬টি, জাপানের ১৯টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ১১টি; অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে ও

নেদারল্যান্ডসের প্রতিটির ১০টি, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ৯টি, কানাডা ও ফ্রান্সের প্রতিটির ৮টি, সুইডেন ও জার্মানির প্রতিটির ৬টি। মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশ ভিত্তিক ৯টি এনজিও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুসারে ৩৪২ জন বিদেশি নাগরিক ও ১৫,৮১৫ জন বাংলাদেশি এ সকল এনজিওতে কাজ করছেন। (শেখ, ২০১৪)

প্রধানমন্ত্রী সংসদে বাংলাদেশে বিদেশি এনজিওর কার্যক্রম প্রসঙ্গে কোন এক প্রশ্নের উত্তরে এ সকল তথ্য দিয়েছেন।

বৈদেশিক অর্থে পরিচালিত সকল এনজিও একই ধরনের নয়। তাদের মধ্যে নানা অমিল রয়েছে, যেমন– সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থের উৎস, কাজের ক্ষেত্র, লক্ষ্য। সেই সাথে মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। কাজের ব্যাপ্তি বিচার করলে তিন ধরনের এনজিও দেখতে পাওয়া যায়–আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও ও স্থানীয় এনজিও। অন্যভাবে, এনজিওর মূল লক্ষ্য ও কাজের দিক থেকে শ্রেণিবিভাজন করলে আমরা পাই–উন্নয়নমুখী এনজিও, পরিবেশবাদী এনজিও, মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও, ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট এনজিও ইত্যাদি।

এনজিওর দুনিয়ায় ইদানীং ধর্মভিত্তিক এনজিওর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। খ্রিস্টান ও হিন্দু চ্যারিটি বা মিশনারি সংস্থার পাশাপাশি আমরা ক্রমবর্ধমান ইসলামভিত্তিক বা মুসলিম এনজিওও দেখতে পাই, এদের মধ্যে কিছু কিছু আবার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত। মুসলিম এনজিওগুলো বাংলাদেশ মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (আমওয়াব) নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, যা অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপিং এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর সমান্তরাল যৌথ সংস্থা (আমব্রেলা অরগ্যানাইজেশন)।

এছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার অপ্রাতিষ্ঠানিক (ইনফর্মাল) এবং সরকারি সহায়তা নির্ভর এনজিও। তাদের কর্মপন্থা এবং গুরুত্বের ক্ষেত্র আলাদা, একইভাবে সাফল্য ও ব্যর্থতাও আলাদা। কিন্তু এরা সকলেই বাজার ও রাষ্ট্রের মধ্যকার শূন্যস্থান পূরণে সম্পূরক ভূমিকা পালন করছে।

যেহেতু এনজিওগুলো বহু রকম, একটি আরেকটি থেকে আলাদা; সে কারণে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিছু অ্যাক্টিভিস্ট এনজিওর ওপর দৃষ্টি দিয়ে কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে এ সকল সংস্থা পার্টির বাইরে রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম। অন্য কথায়, এগুলো মূলত 'প্রচলিত পার্টি বা সরকারের কাঠামোর বাইরে গিয়ে কিন্তু রাষ্ট্রের ধারণাকে স্বীকার করে রাজনীতির বিকল্প উন্মুক্ত ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা'। কিংবা অন্য কথায়, 'ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ করতে নতুন রাজনৈতিক অস্ত্র খোঁজার চেষ্টা' (কোঠারী, ১৯৮৪)।

অপরদিকে কেউ যদি উন্নয়নমুখী প্রধান এনজিওগুলোর দিকে নজর দেয় তবে এটি ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে 'বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর বেসরকারীকরণ নীতিই এনজিওর গুরুত্ব বৃদ্ধির মূল কারণ' (ওয়েস্টারগার্ড, ১৯৯৬)। এটিও বলা যুক্তিসংগত হতে পারে যে 'দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা এনজিও ও সরকারকে তাদের বেসরকারীকরণ এজেন্ডা পালনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে, যা বাংলাদেশে এনজিওর ধরন ও গঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক' (লুইস, ১৯৯৪)।

শিভজি (২০১৭) বলেছেন, এনজিওর নেতা ও অ্যাক্টিভিস্টদের সাধু উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও 'উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন কাজের প্রভাব' লক্ষণীয়। শিভজির যুক্তি, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এনজিও কোন জনহিতকর উদ্দেশ্যে গঠিত নয়, বরং তা মূলত নয়া-উদারবাদী ধারার একটি ফলাফল। জেমস পফাইফার (২০০৩) মোজাম্বিকে এনজিও সম্পৃক্ততার ওপর তাঁর সমীক্ষায় সেখানকার স্বাস্থ্য খাতে এনজিওর নেতিবাচক ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, মোজাম্বিকের স্বাস্থ্য খাতকে এনজিও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে, জাতীয় নিয়ন্ত্রণকে নস্যাৎ করেছে এবং এতে করে দেশে সামাজিক অসমতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে (পফাইফার, ২০০৩)।

বস্তুত উন্নয়ন খাতে এনজিও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে দারিদ্র্যের কাঠামোগত সমাধানকে অস্বীকার করার সুবিধাজনক উপায় হিসেবে। নয়া-উদারবাদী সংস্কারের (১৯৮০-৯৫) জোয়ারের মধ্যে এনজিওগুলোকে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বেসরকারীকরণের কার্যকর সমন্বিত অংশ হিসেবে সামনে আনা হয়েছে। এনজিওর বিকাশকালে ওসমানী (১৯৮৯) একে বলেছেন 'লেইসেজ ফেয়ার অ্যাপ্রোচ' (অবাধ বাজার নীতি) এবং এর বহুমাত্রিক মুক্তবাজারমুখী সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। লুইস (১৯৯৪:৭৬-৭৭) লক্ষ্য করেন–

> বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক (যা আসলে একটি 'কোয়াসি-এনজিও') সম্প্রতি ঋণ প্রদানের একটি নতুন ধরনকে সামনে এনেছে (সেই সাথে ভীষণ উচ্চহারে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়াও নিশ্চিত করেছে), অথচ দারিদ্র্য বিমোচনের কোন রকম কাঠামোগত সংস্কারের ধারণাকে সামনে আনেনি। যদিও এই ব্যাংকের মূল লক্ষ্য অত্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী (আরও সুনির্দিষ্টভাবে অত্যন্ত দরিদ্র নারীগোষ্ঠী), এটি তৎসত্ত্বেও অর্থনীতির পুরনো 'চুইয়ে পড়া তত্ত্বের' কিছু দিক বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে।

আরও কিছু গবেষণা দেখিয়েছে যে এই ব্যাংক গ্রামের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে মূলত বাদ দিয়ে দিয়েছে, যেহেতু এই জনগোষ্ঠীর ঋণ ব্যবসায় অংশগ্রহণের ক্ষমতাই নেই (রহমান ও সেন, ১৯৯৫; মুহাম্মদ, ২০০৯)।

পেত্রাস ও ভেল্টমায়ার (২০০১:১২৯) উল্লেখ করেছেন–

> এনজিওর বিস্তৃতি কাঠামোগত বেকারত্বের হার কমাতে পারেনি, কিংবা পারেনি কৃষক উচ্ছেদ সমাধানে কোন ভূমিকা রাখতে; ঠিক একইভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতেও কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এনজিও যা করেছে তা হল পেশাজীবীদের একটা ছোট গোষ্ঠীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় আয় নিশ্চিত করেছে যারা নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির ধাক্কা থেকে মুক্ত থেকে বিদ্যমান সামাজিক বিন্যাসে উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত হতে পেরেছে, কিন্তু যা দেশ এবং অপরাপর জনগোষ্ঠীকে ঠিকই বিপর্যস্ত করেছে।

পশ্চাদপসরণ, অঙ্গীভবন ও মেরুকরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিওর প্রতিশ্রুতি ছিল তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, যা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং সনাতন ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। তারা কাজ শুরু করেছিল বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন– অসমতা, স্বাস্থ্য খাতের অপ্রতুলতা, দরিদ্রকে শোষণ, বঞ্চনা ও আধিপত্যবাদী ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে সক্রিয় করে তোলা। যা হোক, অধিকাংশই তাদের এই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে এবং মূলত বাজারমুখী তৎপরতায় নিজেদের কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত করেছে। রাষ্ট্রের আইনগত বিধিনিষেধ, ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সাথে বৈরী সম্পর্কের ঝুঁকি, তহবিলদাতা সংস্থার প্রভাব ইত্যাদি এই পশ্চাদপসরণের মূল কারণ। এর ফলাফল হিসেবে এনজিওর কার্যক্রম শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক ও স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।[২]

এই পশ্চাদপসরণের মূল দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হল–

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন

'অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন' ধারণার মানে হল তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে টার্গেট গ্রুপ খুব সহজে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়' অংশ নিতে পারে, এনজিও এক্ষেত্রে কোন কিছু চাপিয়ে না দিয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে কেবল।

তবে 'অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন'–এই ধারণা এনজিওর জন্য নতুন কিছু নয়, এটি কমিউনিটি উন্নয়ন ও স্বনির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই এদেশে উপস্থিত ছিল (মুহাম্মদ, ১৯৯৫)। তবে এটি সত্য যে এই ধারণাটি এনজিওর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরও বিকশিত হয়ে ওঠে। এনজিও মডেলের আগে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টারও টার্গেট গ্রুপ ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠী। কিন্তু বিভিন্ন কারণে টার্গেট গ্রুপভুক্ত মানুষ এর সুবিধা ভোগ করতে পারেনি (খান, ১৯৮৩; খান, ১৯৮৭)। এই পরিণতি এড়াতে এনজিও মডেলে টার্গেট গ্রুপের সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং তাদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়।

এই 'অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া' পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সাথে এনজিওর লিখিত দাবির যোজন যোজন ফারাক এবং এর কারণ ব্যক্তিগত বিচ্যুতি বা অদক্ষতা নয়। প্রতিটি সংগঠন তাদের কাজ শুরু করে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এইসব নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগেই তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। অর্থ জোগাড়ের জন্য একটি প্রস্তাবনা ও সেই সাথে কর্মসূচির বিশদ বিবরণ পেশ করতে হয়। ফলে এনজিওগুলোকে পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম ও লক্ষ্য অনুযায়ী তথাকথিত অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম আগেই শুরু করে দিতে হয়। মূলত তারা যা করে তা হল টার্গেট গ্রুপকে এই বিশ্বাস ও ধারণা দেয়া যে এটা তারা নিজেরাই তৈরি করেছে। ফলে কর্মসূচি ও প্রস্তাবনাও সেই অনুযায়ী অনুমোদিত হয়। যেসব এনজিও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোই ভীষণ রকম অগণতান্ত্রিক। চ্যারিটি সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে তারা কর্মীদের যে কোন রকমের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকেও অস্বীকার করে চলেছে। এখানে কর্মী বা কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিত কিংবা স্থায়ী নয়। চাকরির নিরাপত্তা নেই, যখন-তখন ইচ্ছামত কর্মী ছাঁটাই হতে পারে। কর্মীদের কর্মঘণ্টা প্রায়ই প্রলম্বিত হতে থাকে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ এনজিও খাতে, কারণ এখানে নিম্নবেতনে অনেক কর্মী নিয়োগ দেয়া সম্ভব (মুহাম্মদ, ১৯৮৯)।

উপরন্তু, ওপর থেকে নিচ বা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচের জন্য দায়ী এনজিও মডেল। সাধারণত এনজিও পরিচালিত হয় একক ব্যক্তির দর্শন ও কর্তৃত্বের বলে। বাস্তবে তা একজন ব্যক্তি বা পরিবার যার নির্দেশে পুরো সংগঠন পরিচালিত হয় (মুহাম্মদ, ২০০০)[৩]।

ক্ষমতাকাঠামো

এনজিওর প্রধান লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে আরেকটি ছিল সেই স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোকে দুর্বল করে দেয়া, যা জনসাধারণের উদ্যোগ ও শক্তিকে দমিয়ে রাখে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বস্তুত বিগত চার দশকের এনজিওর ইতিহাস আসলে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতাকাঠামোর সাথে নিজেদের একীভূতকরণের ইতিহাস। বাস্তবে পুরনো ক্ষমতাকাঠামোর সাথে আপসের মাধ্যমে মূলধারার এনজিও অভিজাত শাসকশ্রেণির একটি অংশে পরিণত হয়েছে। কিছু এনজিও রয়েছে, যাদের উদ্ভব ঘটেছিল গ্রামীণ অভিজাত শক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানোর স্পৃহা নিয়ে, কিন্তু কিছু বিরোধপূর্ণ সংঘাতের পর তারা তাদের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে আপস করতে শুরু করেছে।

এনজিও, সরকার ও 'দাতা'

সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফলে নানা ধরনের তৃণমূল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি প্রশাসনের অদক্ষতা ও অক্ষমতা বাংলাদেশের মত একটি দেশের জন্য খুবই সাধারণ ঘটনা। ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, নিশ্চল উৎপাদনশীল শক্তি এই পরিস্থিতিকে আরও খারাপ ও ভীতিকর করে তুলেছে। এমতাবস্থায় দাতাগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাসমূহ এনজিওকে প্রায় সকল সরকারি কর্মসূচির বণ্টন প্রতিনিধি (ডেলিভারি এজেন্সি) হিসেবে বহাল রাখতে ইচ্ছুক। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শুধুমাত্র বণ্টন প্রক্রিয়ায় নয়, বরং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায়ও এনজিওর অংশগ্রহণ একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই নীতিগত পরিবর্তন ঘটে ১৯৮০-র প্রথম ভাগে; একজন এনজিও মুখপাত্র বিষয়টিকে দেখেছেন এভাবে–

> বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির পরিপূরক প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য সরকার এখন এনজিওকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিছু মন্ত্রণালয়, যেমন কৃষি ও বন, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকার ও পলি উন্নয়ন ইতোমধ্যে এনজিওর সাথে যৌথ কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তারা বেশ কিছুসংখ্যক যৌথ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং এরকম আরও নতুন সম্ভাবনার কথা ভাবছে। আশা করা যায়, এনজিও এবং সরকারের এই যৌথ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে; যেহেতু এনজিও কার্যকরীভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং দাতাগোষ্ঠীও তাদের অনুদান পাঠানোর জন্য এনজিওকে একটি দক্ষ পথ হিসেবে খুঁজে পেয়েছে (হুদা, ১৯৮৪)।

পুরনো 'অনুপস্থিত উপাদান' (মিসিং কম্পোনেন্ট) তত্ত্ব

এনজিও মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল উন্নয়নের নতুন তত্ত্ব হাজির করা, যা দারিদ্র্যবান্ধব প্রভাবশালী উন্নয়ন তত্ত্বের সাথে বিপরীত হবে। কিন্তু দ্রুতই এনজিও মনোযোগ দিতে থাকে ঋণ-প্রদায়ী ও রপ্তানিমুখী কার্যক্রমের দিকে। এটি বললে ভুল হবে না যে–

> নির্মম পরিহাস এই যে শুরুতে এনজিও 'চুইয়ে পড়া' তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ'কে সামনে এনেছিল। অথচ তা করতে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে তারা সেই তত্ত্বকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামীণ উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ঋণদান প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে (লুইস, ১৯৯৪:৯৩)।

দরিদ্রকে ঋণ প্রদান এবং একে উন্নয়নের নিয়ামক ও দারিদ্র্য বিমোচনের নিয়ামক হিসেবে দেখা সেই পুরনো ১৯৫০ সালের অতিশায়িত তত্ত্বকেই প্রতিনিধিত্ব করে, যা উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের অনুন্নয়নের জন্য পুঁজির অপ্রতুলতাকে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করে। এই তত্ত্ব মতে, পুঁজি হচ্ছে এসকল দেশের 'অনুপস্থিত উপাদান'। (মেয়ার এবং সিয়ার্স, ১৯৮৪)। বলাই বাহুল্য, এই তত্ত্ব উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে পুঁজি রপ্তানি ও বিদেশি 'সাহায্যের' মাধ্যমে পুঁজির প্রবাহের যৌক্তিকতা দান করে।

১৯৭৪ সালে ব্র্যাক ছোট ছোট দল (গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী) তৈরি করে 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ'কে সামনে এনে তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রচলন করে; এই সংস্থা পরবর্তীতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিওতে পরিণত হয়। আরেকটি বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (আশা), যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৬ সালে মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ভ্রূণ

প্রতিষ্ঠা করেন একটি প্রকল্প আকারে। এখন এটি সারা বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। ১৯৮১ সালে বেসরকারি ব্যাংক অনুমোদনের ব্যাংকিং নীতি পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।[৪]

১৯৮০-র দশক থেকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সারা দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এটি সেই সময়, যখন বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া/বেসরকারীকরণের ফলে কিংবা কৃষিজমি থেকে উৎখাত হয়ে অসংখ্য কর্মহীন মানুষ দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছিল। এসএপির ভয়াবহ অর্থনৈতিক ধসের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করতে তখন ভিন্ন দরিদ্রমুখী কর্মসূচি, যেমন– 'সুরক্ষা জাল' (সেফটি নেট প্রোগ্রাম) হাতে নেয়া হয়। অনানুষ্ঠানিক খাত (ইনফর্মাল সেক্টর) বিকাশ লাভ করতে থাকে, কারণ উৎখাত হওয়া, বেকার, অরক্ষিত মানুষের কাছে এটাই ছিল তখন একমাত্র উপায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রঋণ এই বাজারে প্রবেশ করে (মুহাম্মদ, ২০১৫)।

মেরুকরণ

এনজিও গোষ্ঠীর মধ্যে মেরুকরণ একটি খুবই উলেখযোগ্য ঘটনা, যা বিগত দুই দশকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খুব অল্পসংখ্যক এনজিও এই খাতের সকল সম্পদ, শ্রমশক্তি ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, বাকি অধিকাংশ এনজিও তাদের অধীনস্থ বা সাবকন্ট্রাক্টর হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।[৫]

এই স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ এনজিও তাদের বাজারমুখী কর্মকাণ্ড যেমন– ক্ষুদ্রঋণ, বহুজাতিক কর্পোরেশনের সাথে যৌথ বিনিয়োগসহ অন্যান্য ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়ে উঠেছে।

এই মেরুকরণ কিছু এনজিওকে মৌলিকভাবে রূপান্তর করেছে, যাকে আমি বলতে চাই বাণিজ্যায়ন বা 'কর্পোরেটাইজেশন'। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক–বহুজাতিক কোম্পানি কিংবা বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থার সাথে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রুপ অব কোম্পানির কেন্দ্র হিসেবে বৈশ্বিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এবং ফলস্বরূপ কর্পোরেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। এই কর্পোরেট এনজিওর উদ্ভব কেবল এনজিও খাতেই নয়, গোটা বিশ্ব-পুঁজিবাদী পরিসরেই একটি নতুন ঘটনা। এটি বেসরকারি মালিকানার এক নতুন ধরন উন্মোচন করেছে, যার উদ্ভব ঘটেছে স্বেচ্ছাসেবামূলক বা দারিদ্র্যসংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদের বিকাশের ধারায় যেভাবে একচেটিয়া বাজার (মনোপলি) বা মুষ্টিমেয়র (অলিগোপলির) বাজার সৃষ্টি হয়, এনজিও জগতেও সেই একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এনজিওর কর্পোরেট সংস্কৃতি, সংবাদমাধ্যম কিংবা সরকারের নীতিনির্ধারণীর ওপর প্রভাব–এসবই তাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে।

এ থেকে বলা যায়, যদিও সংজ্ঞানুসারে এনজিও হচ্ছে 'বেসরকারি সংস্থা', কিন্তু আদতে তারা রাষ্ট্রকাঠামোর বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান নয় বা বে-রাষ্ট্র সংস্থা নয়। এই সকল সংস্থা রাষ্ট্রের আইনানুগ কাঠামোর মধ্যে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং ক্রমশই তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গীভূত অংশে পরিণত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি ক্ষেত্র, যা অবশ্যই বাংলাদেশে এনজিও সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। ঋণবাজারে 'টার্গেট গ্রুপ' হিসেবে নারীকে সামনে আনা ঋণদানকারী এনজিও এবং গ্রামীণ ব্যাংকের একটি বিশেষ সাফল্য। আবার একই সাথে এটিও সত্য যে নারীকে ঋণ দেয়া তুলনামূলক লাভজনক, কারণ এটি প্রমাণিত যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নারী অধিক আন্তরিক ও নিয়মিত। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্রঋণজালের প্রসার গ্রামীণ দরিদ্র নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন উভয়কেই প্রভাবিত করেছে (করিম, ২০১১)। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও জামিন হিসেবে নতুন একটি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছে, সেটি হল 'দলীয় দায়বদ্ধতা'। এটি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবনী সাফল্য।

বেশ কিছু গবেষণা রয়েছে, যা এই নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছে। কিন্তু 'ঋণবাজারে প্রবেশাধিকার' আর 'ক্ষমতায়ন' এক বিষয় কি না তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যদিও এই ঋণসুবিধা নারীর ব্যক্তিগত জীবনে বাড়তি কিছু সুযোগ তৈরি করে এবং সামাজিক জীবনেও কিছু গতিশীলতা আনতে সক্ষম, তবু এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। প্রথমত, ঋণ-কর্মসূচি নারীর জন্য কেবল সেইসব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে, যেগুলোর সাথে সে ইতোমধ্যে অভ্যস্ত। তার মানে এর ফলে তার জন্য নতুন কোন পথ তৈরি হয় না। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির পুরুষ সদস্য নারীকে ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এইখানে ক্ষুদ্রঋণ অনেকটা যৌতুকের ভূমিকা পালন করে। কখনও কখনও এটি নারীর জন্য লজ্জা ও নির্যাতনেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (করিম, ২০১১)। এটি খেয়াল করা গুরুত্বপূর্ণ যে–

> এনজিওগুলোর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও প্রশিকা (তাদের কর্মসূচিতে) বড়সংখ্যক নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। যদিও এদের কেউই নারীকে সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতার দিকে যেতে বা এমন কাজ যাতে আর্থিক প্রাপ্তি উচ্চতর হয় তা করতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি (হামিদ, ১৯৯৫:১৫১)।

এনজিও বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই দাবি করেন যে বিগত চার দশকে নারীনির্ভর শ্রমশক্তির গতিশীলতা এসেছে এনজিওর হাত ধরেই। এই দাবি নারীর টিকে থাকার সংগ্রাম ও আপন ক্ষেত্র নির্মাণের নিজস্ব লড়াইয়ের প্রতি অবমাননা ছাড়া কিছুই নয়; একই সাথে তা অপরাপর কারণকেও তাচ্ছিল্য করার শামিল। এই বক্তব্যের মাধ্যমে অস্বীকার করা হয় নিম্ন আয়ের নারীর সমাজে টিকে থাকার বহু বছরের কৌশলকে, যা এনজিও ধারণার বহু আগে থেকে চর্চিত হচ্ছে এবং সেই সাথে আড়াল করা হচ্ছে সমাজের বহুমুখী গতিশীলতাকে।

বস্তুত বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের দৃশ্যমান আয় দিয়ে তাদের টিকে থাকার সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শোচনীয় নিম্ন আয় সত্ত্বেও এই দেশে পরিবারগুলো টিকে থাকে প্রধানত নারীর অদেখা শ্রমের ওপর নির্ভর করে; নারীর এই নানামুখী শ্রম কখনও পরিবারের পয়সা বাঁচায়, কখনও বাড়তি উপার্জনের পথ তৈরি করে। মজুরিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের কারণ এনজিও নয়, বরং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মারাত্মক দুর্দশা থেকে মরিয়া হয়ে বাঁচার চেষ্টা এবং পুরনো পরিবার প্রথার ভাঙন, যা নারীকে সামাজিক পরিসরে গতিশীলতা দিয়েছে। গার্মেন্টস খাতকে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে দেখানো যায়। এই খাতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নারী শ্রমিকের সংযুক্তি দেশের গোটা শ্রমশক্তির নারী-পুরুষ অনুপাতকে বদলে দিয়েছে; এই নারী শ্রমিকরা নতুন সামাজিক শক্তিতে

পরিণত হয়েছে (মুহাম্মদ, ২০০৭)। এখানকার নিগৃহীত নিম্ন জীবনমান, অনিরাপত্তা, নিম্ন মজুরি সত্ত্বেও এই নারীরা শ্রমিক হিসেবে নতুন আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে। উপরন্তু, একচোখা লিঙ্গীয় ও শ্রেণিবিভাজিত আইনানুগ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তারা নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করানোর সম্ভাবনার পথ পেয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসের বিভিন্ন উপাদান

পার্থ দাশগুপ্ত (১৯৯৬:৮০) দারিদ্র হ্রাস ও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি নিয়ে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা পরবর্তী দশকে একই রকম প্রাসঙ্গিক আছে। তিনি লিখেছেন–

> সাব-সাহারা আফ্রিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ তাদের জাতীয় আয়ের ১০%। মারাত্মক দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন তার থেকে কিছু কম–আনুমানিক জাতীয় আয়ের ৪% এর মত। মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১% ধরলে দারিদ্র্য নির্মূল হতে ১০ বছর এবং মারাত্মক দারিদ্র্য নির্মূল হতে ৪ বছরের মত সময় লাগার কথা। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ ভারত ও পাকিস্তানে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার নিয়মিতভাবে ১% এর ওপর অবস্থান করছে। অথচ এই পর্যন্ত কোন দেশের সূচকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যায় বড় ধরনের হ্রাস/পতন দেখা যায়নি। এসকল দেশগুলোতে বর্ধিত আয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী পর্যন্ত এসে পৌঁছাচ্ছে না।

আমরা দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা শুনি সরকার, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইকোনমিস্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এবং সুবিধাভোগী কনসালট্যান্টদের কাছ থেকে। তারা দেখাতে চায় যে বর্তমান উন্নয়ন তত্ত্ব সুফল বয়ে আনছে এবং বেসরকারীকরণ এবং এনজিও মডেল যৌথভাবে প্রশংসাজনক কাজ করে চলেছে। হ্যাঁ, এই দেশের মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বছরে ৬% ছিল পর পর কয়েক বছর, সরকারি হিসাবে এখন তা ৮%; মাথাপিছু আয় ২০১৩ সালে ১০০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে, বর্তমানে তা ১৯০০ মার্কিন ডলার; বৈদেশিক রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে; অবকাঠামোগত দিক থেকে অনেক নতুন নির্মাণকাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন চলকে এই 'নাটকীয়' ভাল ভাল পরিসংখ্যান মানবজীবন ও পরিবেশের বিবর্ণ চিত্রকে আড়াল করতে পারে না। বরং যথাযথ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই ক্ষেত্রে আরও অবনতি দেখতে পাই (মুহাম্মদ, ২০১৫)।

দারিদ্র্যবিষয়ক পরিসংখ্যানে অনেক সূক্ষ্ম ও পরস্পরবিরোধী বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। খানার আয়-ব্যয় নির্ধারণ জরিপে ২০১০ সালের দারিদ্র্য পরিমাপকে সংস্কার করতে ২০০৫ ও ২০১০-এর উভয় তথ্যকে সন্নিবেশিত করা হয়। এতে দেখা যায় যে দারিদ্র্যের উচ্চ-আয় সীমারেখার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০০৫-এ ৪০% থেকে নেমে ২০১০-এ ৩১.৫%-এ এসে দাঁড়িয়েছে (বিবিএস, ২০১১)। ২০১৬-এর জরিপ থেকে দেখা যায়, তা আরও কমে ২৪.৩%-এ পৌঁছেছে। আবার ঠিক একই রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাই, একই জনগোষ্ঠীর ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা (কিলোক্যালরি/মাথাপিছু/দিন) ২০১০-এর হিসাবে ২৩১৮.৩ থেকে নেমে ২০১৬-তে ২২১০.৪-এ এসে দাঁড়িয়েছে (বিবিএস, ২০১৭)। কীভাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি সত্ত্বেও ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা নিম্নগামী হতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হয়নি।

এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তথ্যের গুণগত মান, তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতির অসামঞ্জস্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের কাছে নানা ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ভারতের দারিদ্র্যবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত প্রসঙ্গে পাটনায়েকের বিস্তৃত পর্যালোচনা থেকে ভারতের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি সে ধরনের অসংগতি বাংলাদেশসহ অন্য অনেক দেশের জন্যই সত্য (পাটনায়েক, ২০১৩)। দারিদ্র্য পরিমাপ সূচকের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও (বিশ্বব্যাংক, ২০০১) বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী এসব পরিমাপকের ওপর ভিত্তি করেই সাফল্যের প্রশংসাবাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবে তারা স্বীকার করেছে যে যদি দারিদ্র্য পরিমাপক সীমা নির্ধারণীতে খুব সামান্য পরিবর্তন আনা হয়, তবে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, যদি আমরা দারিদ্র্যসীমা মাথাপিছু প্রতিদিনের আয় ১.০৯ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করি তবে দারিদ্র্যসীমার নিচে জনগোষ্ঠী পাই ৩১.৫%। আবার যদি আমরা দারিদ্র্যসীমা সামান্য বাড়িয়ে মাথাপিছু প্রতিদিনের আয় ১.২৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করি তবে দারিদ্র্যকবলিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪৩.৩%। আমরা যদি ২ মার্কিন ডলারে হিসাব করি তবে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৫.৮%-এ (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)।

সাম্প্রতিক সরকারি দলিলপত্র থেকেই এমন চিত্র আমরা পাই, যার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এনজিও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট অভিন্ন পরিমাপে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত দরিদ্র মানুষের অনুপাত পুরো দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। হিসাব অনুযায়ী, দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত মানুষের অনুপাত বাংলাদেশে যখন ছিল ৩১.৫%, ভারতে তখন তা ছিল ২৯.৮%, নেপালে ২৫.২%, ভুটানে ২৩.২%, পাকিস্তানে ২২.৩% এবং শ্রীলঙ্কায় ৮.৯%। কেন ক্ষুদ্রঋণ এবং এনজিও মডেলের ব্র্যান্ড দেশে দারিদ্র্যের হার দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কোথাও দেয়া হয়নি (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

বিগত তিন দশকে ক্রমবর্ধমান 'অর্থনৈতিক অসমতা' আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় দারিদ্র্য ও অসমতা জরিপের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮৩ সালে নিম্নস্থ ৫% আয়ের মানুষের অধিকারে ছিল ১.১৭% সম্পদ, যা ২০১০-এ নেমে দাঁড়ায় ০.৭৮%-এ। অন্যদিকে ১৯৮৩ সালে শীর্ষস্থ ৫% মানুষের অধিকারে ছিল ১৮.৩০% সম্পদ, যা ২০১০-এ বেড়ে দাঁড়ায় ২৪.৬১%-এ। ফলে এই সময়কালে শীর্ষ ৫% ও নিম্ন ৫% আয় উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীর বৈষম্যের অনুপাত বেড়েছে ১:১৫ থেকে ১:৩২ পর্যন্ত (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

২০১০ সালে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ মানুষের আয় ছিল ০.৭৮ শতাংশ, সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ০.২৩ শতাংশে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই অনুপাত এক-তৃতীয়াংশে ঠেকেছে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ আয়ের ৫ শতাংশের আয়ের অনুপাত ২০১০ সালে ছিল ২৪.৬১ শতাংশ, ২০১৬ সালে হয়েছে ২৭.৮৯ শতাংশ (বিবিএস, ২০১৭)। ২০১০ ও ২০১৬ সালের নিম্নতম আয়ের ৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ আয়ের ৫ শতাংশের আয়ের অনুপাত হিসাব করলে দেখা যায় এই ৬ বছরে বৈষম্য বেড়েছে শতকরা কমপক্ষে ৪০০ শতাংশ। যদি আমরা শীর্ষ ধনীদের ঘোষিত আয়ের সাথে বেআইনি বা অবৈধ সম্পত্তি যোগ করি তাহলে এই বৈষম্যের চিত্র হবে আরও ভয়ানক।

প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে তাই দেখা যায়, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ছাড়াই বাংলাদেশের

জিডিপি এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং সেই সাথে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনযাপন পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের খরচ বেড়েছে; ফলে বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অধিকাংশ মানুষের জন্য এই দুটি ক্ষেত্রই সীমিত বা খুবই ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। অনেক উন্নয়ন প্রকল্প জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কিন্তু মানুষকে নিজেদের জীবিকা থেকে উৎখাত করেছে, নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে ধ্বংস করেছে এবং বাংলাদেশের অনন্য পরিবেশ-জীববৈচিত্র্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রবৃদ্ধির সাফল্যের অনেক দাবিদার দেখা যায়। এনজিও ছাড়াও সরকার থেকে বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষাজাল কর্মসূচি রয়েছে, যেমন–আইআরডিপি, আদর্শ গ্রাম কর্মসূচি, গ্রামীণ সমাজসেবা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং, গ্রামীণ নারী উন্নয়ন কর্মসূচি, যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, গ্রামীণ দরিদ্র সহায়তা কর্মসূচি, পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কার্যক্রম এবং আরও অনেক। ঋণ কার্যক্রমের প্রসারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচি।

এনজিও ছাড়াও ১৯৮০-র দশক থেকে আরও কিছু খাতের প্রবৃদ্ধি অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। রেমিট্যান্স বা বৈদেশিক মুদ্রার আয় লাখ লাখ পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচনা করেছে। গার্মেন্টস, পরিবহন ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি সূচিত হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ দেশের বাইরে থেকে টাকা পাঠাচ্ছে এবং ৪০ লাখ মানুষ–মূলত নারী শ্রমিক গার্মেন্টস শিল্পে সরাসরি জড়িত, যাদের অধিকাংশই দেশের দরিদ্রতম অংশ থেকে আগত।

বিগত চার দশকে গ্রামীণ অঞ্চলে এনজিও জালের বিস্তৃতি সত্ত্বেও এই একই সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন করেছে। গার্মেন্টস ছাড়া তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবহন খাতের সাথে যুক্ত। মুখ্য পরিবহন মাধ্যমগুলোর মধ্যে রিকশা সবচেয়ে কম 'ইউনিটপ্রতি বাড়তি মূল্য' তৈরি করতে সক্ষম, কিন্তু জিডিপিতে অবদানের কথা বিবেচনা করলে পুরো পরিবহন খাতে রিকশার অবদান সর্বোচ্চ। ২০ লাখেরও অধিক রিকশা/ভ্যান দেশজুড়ে চলাচল করছে। শুধুমাত্র এই খাতে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ সরাসরি জড়িত। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যম, যেমন– বাস, মিনিবাস, মেশিনচালিত নৌকা ইত্যাদির সাথে জড়িয়ে আছে আরও ১ লাখেরও বেশি মানুষের জীবিকা। স্থানীয় রাস্তা ও জাতীয় মহাসড়কের প্রসার সেই সাথে ক্রমবর্ধমান শহরায়ন পরিবহন খাতে কর্মসংস্থানের বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বিগত দশকে গ্রামীণ সমাজে মানুষ কৃষি থেকে অকৃষি খাতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে বা উপশহরে অভিবাসিত হয়েছে। অভিবাসিত জনগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান হারে ছোট শিল্প-কারখানা, পরিবহন এবং সেবা খাতের সাথে যুক্ত হয়েছে। কাজের জন্য অন্যান্য দেশে সাময়িক অভিবাসনের পরিমাণ বেড়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯০-৯১ সময়কালে কৃষি, বন ও মৎস্য খাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ছিল ০.৮%। ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১০ সময়কালে এই সকল খাতে শ্রমশক্তির অনুপাত ৪৮.৮৫% থেকে কমে ৪৭.৩০%-এ নেমেছে। অকৃষি খাতের মধ্যে কারখানা বা ম্যানুফ্যাকচারিং (ছোট এবং কুটির শিল্প) খাতে সর্বাধিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে (১২%), এই খাতে নতুন ২৩ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এর পরে রয়েছে ব্যবসা, রেস্তোরাঁ, নির্মাণ ও পরিবহন (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৫)।

এরকম তথ্য-প্রমাণ পাওয়া সম্ভব যে এনজিওর ঋণ কর্মসূচি গ্রামীণ এলাকায় অকৃষি কাজের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, যেমন–ছোট ব্যবসা, ছোট মহাজনি, স্বল্প পরিসরে হাতের কাজ এবং রিকশা-ভ্যান। তার পরও বেশ কিছু স্বাধীন গবেষণা দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের সীমাবদ্ধতার চিত্র তুলে ধরেছে। তবে ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব বিশাল সাফল্যগাথা রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সাফল্য দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তাদের সাফল্য পাওয়া যায় কর্পোরেট খাতের বিকাশে এবং নতুন উদ্ভাবিত আর্থিক শিল্প খাতের বিকাশে (মুহাম্মদ, ২০০৯)।

ব্র্যাক প্রসঙ্গ

ব্র্যাক, যা একসময় ছিল জাতীয় পর্যায়ের এনজিও, তা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি পূর্বে পরিচিত ছিল বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি বা ব্র্যাক (বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়তা কমিটি) নামে, যা পরে বদলে হয় বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি বা ব্র্যাক (বাংলাদেশ গ্রামীণ অগ্রগতি কমিটি)। আরও বিস্তৃত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করার পর বর্তমানে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানটি আর আগের নামগুলো ব্যবহার করছে না। তর্কাতীতভাবে এটি এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর ব্র্যাক বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় শাখা বিস্তার করেছে। অন্য বেশ কিছু দেশেও এই সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে; যেমন–আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, উগান্ডা, তানজানিয়া, দক্ষিণ সুদান, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও হাইতি। ১৯৭৪ সালে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রচলন করে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্র্যাক সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছে এভাবে : 'পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, দ্রুততম সময়ে বিকশিত বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং খুবই বাণিজ্যমুখী (বিজনেসলাইক) সংস্থা'। এখানে আরও বলা হয়, 'যদিও মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন দরিদ্রদের সহায়তা করার জন্য, কিন্তু তাঁর গ্রামীণ ব্যাংক এই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তকও নয়, কিংবা তাঁর দেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানও নয়; ব্র্যাকের বছরপ্রতি ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার' (ইকনমিস্ট, ২০১০)।

১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্র্যাকের মূল মনোযোগ ছিল পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন। পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল কৃষি, মৎস্যপালন, সমবায় সমিতি, গ্রামীণ হস্তশিল্প, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নারীর জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন। ১৯৭৭ সালে ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়নের মডেল থেকে আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কাজের দিকে মনোযোগী হয়। এজন্য তারা 'গ্রাম সংগঠন' নামে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দল গঠন করে। একই বছর এটি একটি বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করে। আড়ং নামের হস্তশিল্পের বিপণন কেন্দ্রটি (চেইন শপ) প্রতিষ্ঠিত হয় তার পরের বছর।

১৯৭৯ সালে ব্র্যাক দেশব্যাপী ওরাল থেরাপি এক্সটেনশন প্রোগ্রাম (ওটিইপি) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে প্রবেশ করে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা, যা বাংলাদেশের শিশুমৃত্যুর উচ্চ হারের অন্যতম কারণ। প্রাথমিকভাবে ব্র্যাকের এইসব বর্ধিত কর্মসূচির সাফল্য এর অপরাপর কর্মসূচিকেও বিকশিত করে,

যার মধ্যে রয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, যা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৬ সালে ব্র্যাক পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করে, যার চারটি মূল পদক্ষেপ ছিল–প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং সেই সাথে কার্যকর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা, আয় ও কর্মসংস্থান তৈরি এবং সহায়তা সেবা কর্মসূচি। ১৯৯১ সালে নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

১৯৯৮ সালে ব্র্যাকের বাণিজ্যিক দুগ্ধখামার (ডেইরি) এবং খাদ্য প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। তার পরের বছর তারা একটি তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান চালু করে। ২০০১ সালে ব্র্যাক একটি বাণিজ্যিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম 'ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়'। একই বছর ব্র্যাক ব্যাংকও যাত্রা শুরু করে।[৬] এই ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ফজলে হাসান আবেদ, তামারা হাসান আবেদসহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি।[৭]

আগেই বলেছি, ব্র্যাক 'আড়ং' নামে খুচরা বিপণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৮ সালে। একটিমাত্র দোকান থেকে আড়ং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চেইন শপে পরিণত হয়; এর ২০টি দোকান বাংলাদেশের প্রধান মহানগরীগুলোতে অবস্থিত। ২০০৪ সালে এর মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৪ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে এই পরিমাণ ৫ কোটি টাকায় পৌঁছায়। আড়ংয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের দাবি অনুযায়ী যুক্ত আছে ৬৫ হাজার কারিগর/শিল্পী। আড়ং রপ্তানি ক্ষেত্রেও দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালে রপ্তানি শুরু হয়, এখন তা ১৫টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত হয়েছে। (https://www.aarong.com/)

২০০৮ সালেই বিশ্বের প্রভাবশালী দৈনিক গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ ছিল এরকম–

> ৩০ কোটি মার্কিন ডলারের বিশাল বাজেট, ১ লক্ষেরও বেশিসংখ্যক কর্মচারী, ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ১৯ তলা ভবন... ব্র্যাকের ফুলেফেঁপে ওঠা অর্থনৈতিক প্রভাব এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া ক্ষমতা কারও কারও মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এরকম অভিযোগ আছে যে ব্র্যাক রাষ্ট্রের সমান্তরালে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, পার্থক্য হল রাষ্ট্রের মত তাদের কারও প্রতি দায়বদ্ধতা নেই।

ব্র্যাক যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী তেল কোম্পানি ইউনিয়ন অয়েল কোম্পানি অব ক্যালিফোর্নিয়া (ইউনোক্যাল) এবং বীজ কোম্পানি মনসান্টোর সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে। পরবর্তীতে তারা হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের দিকেও অগ্রসর হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের লাখ লাখ চাষিকে ফসলের হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের জন্য তারা উদ্বুদ্ধ করে। গ্রামীণ ব্যাংকেরও ঠিক একই রকম বাণিজ্যিক বিকাশের ধারা শনাক্ত করা যায় (মুহাম্মদ, ২০০৯)।

বস্তুত ব্র্যাক এনজিও খাতে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে; দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্পোরেট পুঁজির সাথে সংযুক্ত করতে এবং বৃহৎ কর্পোরেশনকে বাজারের পথ খুলে দিতে তারা এনজিওর কর্পোরেটাইজেশনকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার এক নতুন ধরন প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭২ সালে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর প্রধান একক কর্তৃত্ব, তাঁর সন্তান ও স্বজনরাই ছিলেন তাঁর স্থায়ী সহযোগী। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সন্তান ও প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নানা দায়িত্ব বণ্টন করেন। কর্পোরেট গ্রুপ অব কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষ ব্র্যাকের সকল সংস্থার নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

আন্দোলনে এনজিও

বর্তমান বৈশ্বিক (অ)ব্যবস্থায় আমরা কিছু এনজিও দেখতে পাই, যারা বিভিন্ন জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম বা বিভিন্ন তৎপরতায় যুক্ত। তাদের অনেকেই যুদ্ধ, ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি ইত্যাদির বিরোধিতা করে; লিঙ্গীয়, জাতিগত, বর্ণগত বৈষম্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধেও অনেককে সক্রিয় দেখা যায়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির সাথে নীতি, কর্মসূচির বিরুদ্ধেও কর্মসূচি দেখা যায়। পরিবেশ বিষয়ে অনেককেই সক্রিয় দেখা যায়। উদ্বাস্তু, প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন নিয়েও অনেকে কাজ করে। কিছু এনজিও রয়েছে, যারা পুঁজিবাদের বিকল্প দর্শনের প্রতি সমর্থন নিয়ে এবং নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান ধরে রেখেছে। অনেককেই আবার যথেষ্ট গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। ইউরোপ-আমেরিকায় কোন কোন এনজিওকর্মীদের বাম রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখা যায়। অনেক কর্মসূচিতে এই এনজিওগুলোর সাথে বাম দলগুলোর যৌথ কর্মসূচিও এখন প্রায়ই দেখা যায়। উইলিয়াম ইস্টারলি সঠিকভাবেই বলেছেন, 'যে সকল এনজিও এখানে প্রতিবাদ জারি রেখেছে তারা এখনও এই আশা দেখায় যে অধিকার নিয়ে প্রচারণার কিছু প্রভাব আছে।' কিন্তু সেই সাথে তিনি এও বলেছেন, 'কৌশলগত (টেকনোক্রেটিক) অ্যাপ্রোচ দিয়ে ব্যক্তি অধিকার বনাম স্বৈরতন্ত্রের বৈশ্বিক আদর্শগত লড়াইকে অপ্রাসঙ্গিক করা সম্ভব–এই বিশ্বাস একটি বিভ্রম মাত্র (ইস্টারলি, ২০১৩)।

অ্যাক্টিভিস্ট এনজিওগুলোর মধ্যেও নানা রকম পার্থক্য রয়েছে, যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে বহু কষ্টকর পথে তহবিল জোগাড় করে কাজ করে এবং যারা পশ্চিমা দেশগুলো থেকে তহবিল নিয়ে প্রান্তিক দেশগুলোতে কাজ করে তাদের অবস্থান একই রকম থাকে না। বাংলাদেশ ও ভারতের মত দেশগুলোতে অর্থের প্রবাহ ও নির্ভরশীলতার কারণে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিরোধের কীভাবে অবক্ষয় ঘটে তা অরুন্ধতী রায় (২০১৪) ভালভাবেই ধরতে পেরেছেন–

> অবশ্যই, কিছু এনজিও মূল্যবান কাজ করছে। কিন্তু এনজিওর প্রপঞ্চকে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে ১৯৮০-১৯৯০ এর শেষভাগে তহবিলনির্ভর এনজিওর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থার হাতে ভারতের বাজার খুলে দেবার সাথে এনজিও বিকাশের সময়কাল মিলে গেছে। সেই সময়, ভারত রাষ্ট্র কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির পূর্বশর্ত অনুযায়ী পল্লি উন্নয়ন, কৃষি, জ্বালানি, পরিবহন ও গণস্বাস্থ্য খাত থেকে রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রত্যাহার করে নিচ্ছিল।...দীর্ঘ মেয়াদে এনজিও দায়বদ্ধ তাদের তহবিলদাতাদের কাছে, যাদের মধ্যে তারা কাজ করছে তাদের কাছে নয়।...এটি সংঘাতকে দর-কষাকষিতে পরিণত করে। প্রতিরোধকে তারা অরাজনৈতিক করে তোলে...। সত্যিকার রাজনৈতিক প্রতিরোধ এই ধরনের কোন শর্টকাট পথ দিয়ে চলে না। রাজনীতির এনজিওকরণ প্রতিরোধকে পরিশীলিত, পরিমিত, নয়টা-পাঁচটার বেতনভোগী কাজে পরিণত করার হুমকি সৃষ্টি করে।

উপসংহার

গোটা এনজিও ব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম অসংগতি-অবক্ষয় এবং উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা একটি বিকল্প ঋণদানকারী ব্যবস্থা গড়ে

তুলেছে, নারীকে যোগ্য ঋণগ্রহীতা হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে, মহাজনের সনাতনি একক ক্ষমতা হ্রাস করেছে এবং কিছু কিছু প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারা কার্যকরভাবে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে, এছাড়াও বেশ কিছু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে আইনগত ও অন্যান্য সেবা পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু খণ্ড খণ্ড চেষ্টা এবং উচ্চ-ব্যয়বহুল কার্যক্রম এ সকল কাজকে দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা নষ্ট করেছে।

তবে যাই হোক, এই সকল সফলতা-ব্যর্থতা, অর্জন-সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করেছে যে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অশিক্ষা, পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা, লিঙ্গীয় অধস্তনতা এবং অনাবিষ্কৃত উৎপাদনশীল সম্ভাবনা–এসব কোন স্থানীয় বা ব্যক্তিক সমস্যা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ এবং এর সত্যিকার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জাতীয় উদ্যোগ, সামাজিক আন্দোলন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকল্প উন্নয়ন দর্শন। এটি নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। একে সামনে এগিয়ে নিতে তৃণমূল সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এনজিও মডেলের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব নয়।

'স্বেচ্ছাসেবী', 'তৃণমূল' সংগঠন হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন কিংবা এটি জনগণের জন্য বিকল্প পথ তৈরি করেছে–এমন দাবি সত্ত্বেও উচ্চ-ব্যয়বহুল এনজিও মডেল ইতোমধ্যে এমনকি দেশে একটি উৎপাদনশীল ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাদের সীমাবদ্ধতার প্রমাণ দিয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে বৈশ্বিক পুঁজির সাথে এনজিওর অঙ্গীভবন, দরিদ্র ও সম্পদশালী কিংবা ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও জগতের মেরুকরণ, প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি থেকে পশ্চাদপসরণ এবং আধিপত্যবাদী ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ আসলে বিদ্যমান এনজিও মডেলের যৌক্তিক ফলাফল।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

টীকা

১. প্রিন্স অব ওয়েলস বিজনেস লিডার ফোরামের সাথে ডেইলি স্টার আয়োজিত 'সৃষ্টিশীল ব্যবসা–এনজিও অংশীদারিত্ব' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ব্র্যাক কর্মকর্তা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

২. এনজিও সংগঠকদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা, তাদের ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক বছরগুলোতে মাঠ জরিপ। এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রশিকা, ব্র্যাক, নিজেরা করি ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

৩. আমি এনজিও নিয়ে গবেষণা শুরু করি তাদের প্রাথমিক সময়কালে। আমি প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে এনজিও সংগঠকদের সাথে ১৯৭৯-৮০ এবং তার পরবর্তী সময়ে সফর করেছি। প্রথমত, আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি সে সময় তাদের বৈশিষ্ট্য, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে লিখেছি 'ভূমিহীনদের লড়াই ও সংগঠন', ১৯৮০ সালে। পরবর্তী সময়ে এনজিও নিয়ে আরও বিস্তৃত লিখেছি (মুহাম্মদ, ১৯৮৩)। এরপর কয়েক বছর বিস্তৃত গবেষণা করে গ্রন্থ লিখেছি বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট ও এনজিও মডেল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭।

৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.grameen.com

৫. আমরা যদি শুধু ক্ষুদ্রঋণের ওপর কর্তৃত্ব বিচার করি তাহলে দেখব, 'আমরা ৩টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পাবো–গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও আশা, যারা শতকরা ৬২ ভাগ ঋণগ্রহীতা এবং অনাদায়ী ঋণের ৬৯ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। শীর্ষ ১৫টি প্রতিষ্ঠান শতকরা ৮২ ভাগ ঋণগ্রহীতা এবং অনাদায়ী ঋণের ৮২ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে।' দেখুন : বায়েস, ২০১২ঃ২৮৪।

৬. ব্র্যাকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহৎ নেটওয়ার্কের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৫ সালের শুরুতে ব্র্যাক ব্যাংকের ৬৬টি শাখা, এসএমই ইউনিট রয়েছে ৪৫৮টি, রেমিট্যান্স ডেলিভারি পয়েন্ট ১৮০০টি, এটিএম বুথ ৩৫০-এর অধিক, আপন সময় (অর্থনৈতিক পরিষেবা কেন্দ্র) ১৬টি। এছাড়া সম্পূরক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, বিকাশ লিমিটেড (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস), ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, ব্র্যাক আইটি সার্ভিস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিকাশ দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে।

৭. আরও তথ্যের জন্য দেখুন
http://bracbank.com/Shareholding-Structure.php.

৮. https://www.brac.net/r

৯. উদাহরণস্বরূপ, তামারা হাসান আবেদ ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের মনোনীত ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত হন ২০১৪-এর এপ্রিলে। তিনি ব্র্যাকে যোগ দেন ২০০২ সালে এবং বর্তমানে তিনি ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র ডিরেক্টর। তিনি ব্র্যাকের দুটি সফল সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ–আড়ং ও ব্র্যাক ডেইরির প্রধান। তিনি ব্র্যাকের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেটের সদস্য। তিনি আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ট্রাস্টি এবং ব্র্যাক বাঁশখালী চা, ব্র্যাক কর্ণফুলী চা, ব্র্যাক খৈয়াছড়া চা, ব্র্যাক কোদালা চা এবং ব্র্যাক সার্ভিসের ডিরেক্টর। তিনি তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে ১৯৯৫ সালে ঢাকার পেরেগ্রিন ক্যাপিটালে কর্পোরেট ফাইন্যান্সে। পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কের গোল্ডম্যান স্যাক্সের মার্জার অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি হিসেবে কাজ করেন। দেখুন
http://bracbank.com/Board-Directors.php

তথ্যসূত্র

আনসারী, ২০১৪। Ansary, 2014. Saiful Malek Ansary: Poverty and Self Employment, A Study on 20 Villages, unpublsihed PhD dissertation, Jahangirnagar University, 2014.

বায়েস, ২০১২ Bayes, 2012. Abdul Bayes (ed): *Bangladesh at 40 Changes and Challenges.* Dhaka, AHDPH.

বিবিএস, ২০১১। BBS, 2011. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Government of Bangladesh: The Household Income and Expenditure Survey 2010.

বিবিএস, ২০১৩। BBS, 2013. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Government of Bangladesh: Statistical Yearbook of Bangladesh 2010

বিবিএস, ২০১৭। BBS, 2017. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Government of Bangladesh: The Household Income and Expenditure Survey 2016.

দাশগুপ্ত, ১৯৯৫। Dasgupta, 1995. Partha Dasgupta: *An Enquiry into Well-Being and Destitution,* US,1995.

ইস্টারলি, ২০১৩। Easterly , 2013. William Easterly: *The Tyranny of Experts,* Basic Books, NY.

ইকোনমিস্ট, ২০১২। Economist, 2012. "Bangladesh Development: The path through the fields", November 3.

ইকোনমিস্ট, ২০১০। Economist, 2010. "Brac in business", The Economist, Feb 18th.

গার্ডিয়ান, ২০০৮। Guardian, 2008.
http://www.theguardian.com/society/2008/feb/20/internationalaidanddevelopment.bangladesh
and
https://www.grain.org/article/entries/1640-bangladesh-brac-s-hybrid-seeds-catch-flack-in-international-press

হামিদ, ১৯৯৫। Hamid, 1995. Shamim Hamid: "Gender Dimension of Poverty" in Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain (ed) (1995): *Rethinking Rural Poverty,* Dhaka.

হুদা, ১৯৮৪। Huda, 1984. Khowja Shamsul Huda: "Role of NGOs in development in Bangladesh", Seminar paper, Dhaka.
Bdwi-BDGmGBW, 2013| IFPRI-USAID, 2013 : Bangladesh Integrated Household Survey 2011-2012, Dhaka, April.

করিম, ২০১১। Karim, 2011. Lamia Karim: *Microfinance and Its Discontents: Women in Debt in Bangladesh,* University of Minnesota Press.

খান, ১৯৮৩। Khan, 1983. Akhter Hamid Khan: "A review of Community Development Concepts"; "The Comilla Approach, and some problems encountered", "A Tour of Twenty Thanas". in The works of Akhtar Hamid Khan, Vol,1&11, Bard, Comilla. Lvb, 1987| Khan, 1987. A R Khan: "The Comilla Model and the Integrated Rural Development Programme of Bangladesh, An experiment in "cooperative capitalism", World Employment Programme working paper, ILO, Geneva.

কোঠারি, ১৯৮৪। Kothari, 1984. Rajni Kothari: "The Non-Party Political Process", *EPW,* February 4, Bombay.

লুইস, ১৯৯৪। Lewis, 1994. David J. Lewis: "Catalyst for Change? NGOs, Agricultural Technology and the State in Bangladesh," *Journal of Social Studies,* no. 65, 1994, Dhaka Univeristy.

মেয়ার এবং সিয়ার্স, ১৯৮৪। Meir and Seers, 1984. Gerald M. Meir and Dudley Seers: *Pioneers in Development,* A World Bank Publication.

মুহাম্মদ, ১৯৮৩। আনু মুহাম্মদ : *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন* গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ। করিম প্রকাশিনী। ২য় সংস্করণ, সংহতি, ২০১০।

মুহাম্মদ, ১৯৮৯। Muhammad, 1989. Anu Muhammad: "The Nature and Direction of Participatory and Target group Development Process in Bangladesh", *Jahangirnagar Economic Review,* vol: 4, June, Dhaka.

মুহাম্মদ, ১৯৯৫। আনু মুহাম্মদ : *গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি,* মীরা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, ২০০০। আনু মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল,* ২য় সংস্করণ, প্রচিন্তা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, ২০০৭। আনু মুহাম্মদ : *নারী, পুরুষ ও সমাজ,* ২য় প্রকাশনী, সংহতি প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, ২০০৯। Muhammad, 2009. Anu Muhammad, "Grameen and Microcredit: A Tale of Corporate Success," Economic and *Political Weekly,* August 29. 35-42.

মুহাম্মদ, ২০১৫। Muhammad, 2015. Anu Muhammad: BangladeshÑA Model of Neoliberalism: The case of Microfinance and NGOs, *Monthly Review,*Vol.66, No10, March, NY.

ওসমানী, ১৯৮৯। Osmany, 1989. S.R. Osmany, "Limits to the Alleviation of Poverty through Non-farm Credit," *Bangladesh Development Studies XVII,* 1989.

পাটনায়েক, ২০১৩। Patnaik, 2013. Utsa Patnaik: "Poverty Trends in India 2004-5 to 2009-10," *Economic and Political Weekly,* October 5, 2013, 43-58.

পেট্রাস এবং ভেল্টমেয়ের, ২০০১। Petras and Veltmeyer, 2001. James Petras and Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in 21st Century,* New York: Zed Books.

পফাইফার, ২০১৩। Pfeiffer, 2003. J. Pfeiffer: International NGOs and primary health care in Mozambique: the need for a new model of collaboration. Social Science & Medicine 56 (4).

রহমান ও সেন, ১৯৯৫। Rahman and Sen. Pk. Md. Motiur Rahman, Binayak Sen: "Poverty" in *Experiences with Economic Reform,A Review of Bangladesh's Development,* CPD.

রয়, ২০১৪। Roy, 2014. Arundhati Roy: The NGO-ization of resistance. http://www.towardfreedom.com/51-global-news-and-analysis/global-news-and-analysis/3660-arundhati-roy-the-ngo-ization-of-resistance

শেখ, ২০১৪। Shaikh, E M (2014): "233 Foreign NGOs Working in Bangladesh", *Dhaka Tribune,* 18 June.

শিভজি, ২০০৭। Shivji, 2007. Issa G. Shivji: *Silence in NGO discourse: the role and future of NGOs in Africa.* Oxford, UK.

বিশ্বব্যাংক, ১৯৮৩। WB, 1983. World Bank: Bangladesh, Selected Issues in Rural Employment.

বিশ্বব্যাংক, ১৯৯০। WB, 1990. World Bank: Bangladesh: Poverty and Public Expenditures: An evaluation of the impact of selected government programs on the poor, January.

বিশ্বব্যাংক, ২০০১। WB, 2001. World Bank: World Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty.

বিশ্বব্যাংক, ২০১২। WB, 2012. The World Bank: Bangladesh Development Series, Vol II, Bangladesh: Towards Accelerated, Inclusive and Sustainable Growth−Opportunities and Challenges, June.

ওয়েস্টারগার্ড, ১৯৯৬। Westergaard, 1996. Kirsten Westergaard: "Peoples Empowerment in Bangladesh, NGO Strategies", *The Journal of Social Studies,* No. 72, Dhaka Univeristy.

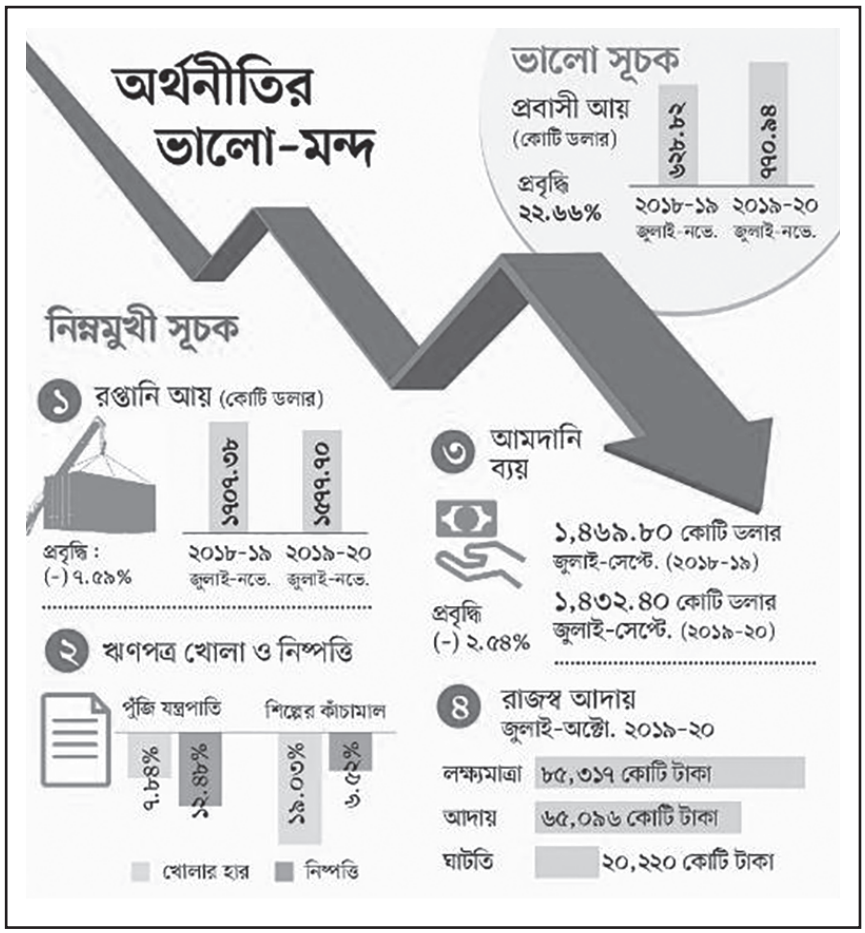

সূত্র: প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৯